দৈনিক সংবাদ
তারিখ 14 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

১৩

ছাত্র রাজনীতির দেউলিয়াত্ব ও সন্ত্রাস-সংঘর্ষ-চাঁদাবাজি

রায়হান শফিক

দেউলিয়া হয়ে গেলে কলকারখানা, ব্যবসাপাতি উঠে যায়। ছাত্র রাজনীতির যদি জাতিকে আর কিছু দেয়ার না থাকে তবে ছাত্র রাজনীতি থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে ছাত্র রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্রদেরকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দানে ছাত্রদেরকে তৈরি করা এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে আরো উন্নত করতে সহায়তা করা। বলাবাহুল্য আমাদের ছাত্র-সংগঠনগুলো এ কাজগুলোর কোনটাই করতে পারছে না। আমার জানা মতে, ছাত্রদেরকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করার কোন কর্মসূচি বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেই।

আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতি একটি অন্যতম স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এর পক্ষে লেখা সহজ। ছাত্র রাজনীতির অতীত গৌরবগাঁথা নিয়ে সহজেই দু'চার পাতা লিখে ফেলা যায়। বিপক্ষে লিখতে গেলেই বিপদ। প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাছাড়া ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার বাহিনীর অ্যাকশন তো আছেই। তারপরেও মনে হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে অপ্রিয় সত্যি কথা বলার সময় এসেছে।

একথা সত্যি যে আমাদের দেশের ছাত্ররাজনীতির সুদীর্ঘ গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছর আমরা একটি ঔপনিবেশিক ও নিপীড়ক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম। ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি– সবক্ষেত্রেই আমরা শোষিত হয়েছি। ছাত্ররা পাকিস্তানি শাসকচক্রের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরই ছিল আমাদের ছাত্র রাজনীতির স্পর্শ অধ্যায়। ছাত্র রাজনীতি তখন কখনও মূলধনের রাজনীতির পরিপূরক হিসেবে কখনও বা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের উচ্চাভিলাষ, রাজনীতিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজনীতিবিদদের অনৈক্য ও অদূরদর্শিতার ফলে পাকিস্তান আমলে রাজনীতির সুষ্ঠু বিকাশ হয়নি। লোভের চোরাবালিতে পড়ে রাজনীতিবিদগণ মাঝেমধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতেন। অনেক সময় রাজনীতিবিদগণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারতেন না। মোট কথা, পাকিস্তান আমলে সময়ের প্রয়োজন ও রাজনৈতিক দলগুলোর পারফরমেন্সের মধ্যে বিস্তর ফাঁক ছিল। এই ফাঁক পূরণের জন্য পেশাদার রাজনীতিকদের বাইরে থেকে কারো এগিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ওই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ছাত্ররাই এগিয়ে আসে। '৪৮, '৫২, '৬২, '৬৬ ও '৬৯-এর আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের সময় আমরা ছাত্রদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করি। উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'– ঢাকায় জিন্নাহর এই হুংকারের মুখে জোরালোভাবে 'না' বলার সাহস ছাত্রদেরই ছিল। বায়ান্নতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে ছাত্ররাই। '৬২, '৬৬ ও '৬৯-এ ছাত্ররাই সবার আগে প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তখনকার ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনীতিকে পথ দেখিয়েছে তাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল ফসল। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত অনেক রাজনীতিবিদই ছাত্র অবস্থায় রাজনীতি শুরু করেছেন।

ছাত্র রাজনীতির এই উজ্জ্বল অতীতের বিপরীতে আজ এক হতাশাজনক চিত্র নজরে পড়ে। অতীতের গৌরব মহিমার আবরণে বর্তমানের কলংক ঢাকা পড়তে হয় না। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অতীতে আমরা যে ছাত্রসংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখেছি তারা এখন চাঁদাবাজি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। গত ২৫শে জানুয়ারি দেশের প্রধান প্রধান দৈনিকগুলোতে দু'টি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের এই অশুভ ঐক্যের খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন ফ্যাকাল্টি ভবন নির্মিত হবে। ব্যয় হবে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। এ কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ১৩ কোটি টাকার হিস্যা যাতে ছাত্র সংগঠনগুলো পায় সেজন্য টেন্ডার খোলার আগের দিন ঢাকায় কথিত ছাত্রনেতাদের বৈঠক হয়। নেতারা এই কাজের জন্য ঠিকাদারদের কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেন। এই টাকা যাতে কোনভাবেই ফস্কে না যায় সেজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহি-নকুল সম্পর্ক থাকলেও চাঁদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐকমত্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও টেন্ডারবাজির ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলোর কথিত ক্যাডারদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সরকারিদলের ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার বাহিনী টেন্ডারের হিস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা– সব জায়গায় ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যানারে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

ছাত্রসংগঠনগুলোর চাঁদাবাজিতে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়া একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। পূর্বে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রধান 'অপকর্ম' ছিল সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ। হাতের কাছে ১৯৯৪ সালের একটি পরিসংখ্যান রয়েছে। ১৯৯৪ সালে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ১৭৭টি সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২১ জন আহত ১২১৮ জন। দেখা যাচ্ছে ১৯৯৪ সালে গড়ে প্রতি ২ দিনে একটি সংঘর্ষ এবং প্রতি ১৭ দিনে একজন নিহত হয়েছে। ব্যক্তিগত বিরোধ, ব্যবসায়িক স্বার্থ, টেন্ডার, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কারণে সংঘর্ষগুলো হয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাঙ্গনগুলো কিছুদিন শান্ত থাকলেও ১৯৯৭-এর শুরুতেই পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠে। সাতানব্বই জুড়ে শিক্ষাঙ্গনগুলো বিশেষত ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে দখল ও পাল্টা দখলের রাজনীতি। সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ অবশ্য এবছর কম ছিল। তবে এবছর ছাত্র সন্ত্রাসীদের হাতে নাজেহাল হয়েছেন দু'জন উপাচার্য। সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় সেশন জট কমানো সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এরশাদ আমলের ৯ বছর অনির্ধারিতভাবে রেকর্ড সংখ্যক দিন বন্ধ থাকে এবং সেশন জটের শুরু ওখান থেকেই। গণতান্ত্রিক শাসনের ৬/৭ বছরে অনির্ধারিত বন্ধ কম হলেও সেশন জট কমানো সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে অভিভাবকদের কাছে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি আগের মতোই রয়ে গিয়েছে এবং তারা সন্তানদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পারতপক্ষে পাঠাতে চাচ্ছে না। সন্ত্রাস-সংঘর্ষজনিত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া বর্তমানে কমলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। ছাত্র সংঘর্ষের কারণে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও অনির্দিষ্টকালের ছুটি চলছে।

সন্ত্রাস বন্ধের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিরোধী অনেকেই। তাদের অভিমত হলো, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়; ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। ছাত্র ও অছাত্র সন্ত্রাসীদের দল থেকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। কাজটি করা মোটেও সহজ নয়। অনেক সংগঠনেই অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা নেতৃত্বে আসীন। তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করলে লাশ পড়ে যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করলে সেখানে তালা ঝুলবে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করলে কাগজে বিবৃতি যাবে, রাস্তায় বিক্ষোভ হবে। বন্দরনগরীতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অভিযোগে পুলিশ গত ৬ই ফেব্রুয়ারি সরকার সমর্থক তিন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে সারা শহর জুড়ে ভাঙচুর ও বোমাবাজি হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজকে ছুঁতে গেলেই পুরো ছাত্র সংগঠন জড়িত হয়ে পড়ছে।

ছাত্র রাজনীতিতে দেউলিয়াত্ব চলছে বলেই কি ছাত্রসংগঠনগুলো সন্ত্রাস-সংঘর্ষ-চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়ছে? গত একবছরে ছাত্র সংগঠনগুলো উল্লেখ করার মতো কোন কর্মকান্ড কি পরিচালনা করেছে? খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে বাংলা একাডেমির বইমেলা উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। ছাত্রলীগ তখন তার আগমন ঠেকাতে কর্মসূচি দিয়েছিল, তাকে কালো পতাকা দেখিয়েছিল। এবার বইমেলা উদ্বোধন করবেন শেখ হাসিনা। ছাত্রদল শেখ হাসিনার আগমন প্রতিহত করার কর্মসূচি নিয়েছে। এটাই কি এখন ছাত্র রাজনীতি? গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেশে যে পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কর্মসূচি কি ছাত্রসংগঠনগুলোর ঝুলিতে নেই? ছাত্র রাজনীতি কি মেধাশূন্য হয়ে পড়েছে? নাকি ছাত্র রাজনীতির নামে নেতারা আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত?

দেউলিয়া হয়ে গেলে কলকারখানা, ব্যবসাপাতি উঠে যায়। ছাত্র রাজনীতির যদি জাতিকে আর কিছু দেয়ার না থাকে তবে ছাত্র রাজনীতি থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে ছাত্র রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ছাত্রদেরকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দানে ছাত্রদেরকে তৈরি করা এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে আরো উন্নত করতে সহায়তা করা। বলাবাহুল্য আমাদের ছাত্র-সংগঠনগুলো এ কাজগুলোর কোনটাই করতে পারছে না। আমার জানা মতে, ছাত্রদেরকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করার কোন কর্মসূচি বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেই। বামপন্থী কয়েকটি সংগঠনের এরূপ কর্মসূচি রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের হলগুলোতে আর যাই থাকুক গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। এক সংগঠনের দখলে থাকা কোন হলে অন্য সংগঠন কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে না।

গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতাও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে খুবই কম। ছাত্র সংগঠনের মিছিল থেকে প্রতিপক্ষের নেতানেত্রীকে সবচেয়ে কদর্য ভাষায় গালাগালি করা হয়। প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীরা ছাত্রদের হাতে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয়। অন্য আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষকদেরকেও ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা লাঞ্ছিত করে। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতেও ছাত্র সংগঠনগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ছাত্র সংগঠনের নেতা নির্বাচিত হয় না; নেতা নির্বাচিত হয় মুরুব্বী সংগঠনের অভিপ্রায় অনুযায়ী। বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় না। মোট কথা, যেসব কারণে ছাত্র রাজনীতি থাকা দরকার তার কোনটিই বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলো করতে পারছে না। মুরুব্বী সংগঠনের সাথে সুর মিলিয়ে শ্লোগান দেয়ার জন্য, ক্যাডার বাহিনীর মাধ্যমে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি চালানোর জন্য এবং গুটিকয়েক নেতার আখের গোছানোর জন্য ছাত্র রাজনীতি থাকার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না তা ভেবে দেখতে হবে।

** রায়হান শফিক ঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান।*